আর এস এস বনাম ভারত

৩

# আর এস এসের গো-মাংস রাজনীতি

সি পি আই (এম) প্রকাশনা

## সূচীপত্র

আর এস এসের গো-মাংস রাজনীতি— বৃন্দা কারাত/৩
আর এস এস ও দেশি গরু — ইন্দরজিৎ সিং / ১৩
প্রাচীন ভারতে গরু — ড: শিউ দত্ত ১৯/

# আর এস এসের গো-মাংস রাজনীতি

বৃন্দা কারাত

## ১

## মোহম্মদ আখলাকের হত্যা

দাদরির বিশাড়ী গ্রামের মো. আখলাক ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় বাসিন্দা। গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে ঈদের উৎসব শেষ হবার পরবর্তী সময়ে স্থানীয় বিজেপি নেতার নেতৃত্বে একদল সমাজবিরোধী-র সংঘবদ্ধ মারে তাঁর নিজের বাড়িতেই মো: আখলাক নিহত হন। তাঁর ছেলে দানিশ বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে আহত হন এবং দু দুটো অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে স্মরণশক্তির ক্ষমতা হারিয়ে বেঁচে আছেন। বাড়ির দু'জন মহিলা সদস্যাকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে বর্বর যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়। দুস্কৃতিকারীরা রক্তমাখা হাত নিয়ে আখলাকদের বাড়িতে অনুসন্ধান চালিয়ে বিজয় গর্বে তাঁর ফ্রিজ থেকে একদলা মাংস খুঁজে বের করে ঘোষণা করে যে, এই মাংস হচ্ছে গো-মাংস। এর মাধ্যমে তারা আখলাককে বর্বরভাবে হত্যা করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করলো।

হত্যার পর তাঁর মেয়ে সাজিদা বললেন, " যখন বোঝা যাবে যে এই মাংস ছাগলের মাংস, তাহলে কি আমার বাবাকে ফিরে পাওয়া যাবে?"

এই এলাকায় দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির গো-হত্যার বিরুদ্ধে যে উন্মাদ প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল, সমাজবাদী পার্টি পরিচালিত রাজ্য প্রশাসনের পুলিশ তাতে গুরুত্ব দেয়নি, শুধু তাই নয়, হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে তারা এই মাংসের টুকরাগুলিকে ফোরেন্সিক গবেষণাগারে পাঠাতেই বেশি তৎপর হয়ে পড়ে। বিশ্লেষণে এই মাংস ছাগলের মাংস বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু আর এস এস এবং বিজেপি ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমন মতামত জারি করে যে, যদি এই মাংস গো- মাংস বলে প্রমানিত হয় তবে এই হত্যাকাণ্ড সঠিকভাবেই

ঘটানো হয়েছে। আর এস এস মুখপত্র অর্গানাইজারে প্রথম পাতায় একটি নিবন্ধে লেখা হয়, গো হত্যাকারীকে হত্যা করার বিধান বেদে দেয়া আছে। সব অভিযুক্তকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি।

এই এলাকা থেকে নির্বাচিত বিজেপি সাংসদ মহেশ শর্মা, মোদি সরকারের একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী। ঘটনার কয়েকদিন বাদে মহেশ শর্মা সেখানে যান এবং গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তরা যাতে ন্যায় বিচার পায় তার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে তাদের পরিবারের সদস্যদের আশ্বস্ত করেন। তিনি এই হত্যাকাণ্ডকে একটি 'দুর্ঘটনা' বলে বিবৃত করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই মন্তব্যের কোন বিরোধিতা করেন নি। দাদরি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে উল্লেখ করতে প্রধানমন্ত্রী দশদিন সময় নিলেন, তাও সেই উল্লেখে কোন গুরুত্ব ছিল না। তিনি এর মধ্যে নিন্দা করার মতো কোন বিষয় খুঁজে পাননি।

এই সমস্ত ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত বলে মনে করা ভুল হবে। গুজব সৃষ্টি করে গো-হত্যার জন্য অভিযুক্ত করে একজন মুসলমানকে হত্যা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমান সমাজের কাছে একটি বার্তা বয়ে নিয়ে যাওয়া। আর এস এসের নেতৃত্বে মুসলিম বিরোধী এ ধরণের প্রচার ঐতিহাসিকভাবেই হয়ে চলেছে। এই বার্তা যিনি প্রথম দিয়েছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁকে 'গুরুজি' বলে মান্য করেন। গোলওয়ালকার বলেছিলেন, যে সব বিদেশি জাতি হিন্দুস্থানে বাস করছে তাদের হিন্দু সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে, ভাষা শিখতে হবে, হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধা জানানো ও মান্য করা শিখতে হবে, হিন্দুজাতি ও সংস্কৃতি ছাড়া অন্য কোন ধারনা বা আদর্শ মেনে চলা চলবে না, অর্থাৎ হিন্দু রাষ্ট্রে তাদের পৃথক অস্তিত্বকে হিন্দু জাতির মধ্যে হারাতে হবে। অন্যথায়, তারা দেশে থাকতে পারবে তবে, হিন্দু জাতির অধীন হয়ে থাকতে হবে, কোন দাবি করতে পারবে না, কোন সুযোগ-সুবিধা আশা করতে পারবে না। আলাদা অগ্রাধিকারসূচক কোন সুযোগ পাবে না এমনকি নাগরিকত্ব ও পাবে না। — মহাদেব সদাশিব গোলওয়ালকার (উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড্)

২০১৫ সালেও আর এস এস হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির ধ্বংসকারী সম্বন্ধে বিকৃত ব্যাখ্যা তাদের প্রতিটি উচ্চারণে ও কাজে অনুসরণ করে চলেছে। এ জন্য এ ধরনের বিকৃত প্রবণতার মুখোশ খুলে দিয়ে তাকে প্রতিরোধ ও পরাস্ত করতে হবে।



## (২)

## গো- হত্যা বিরোধী প্রচারের বাস্তবতা

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের শেষ স্তরে, বিহারের যে অংশে মুসলমান নির্বাচকের সংখ্যা বেশি সেই অংশে, ধর্মের ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলীকে ভাগ করাকে সংঘ পরিবার যে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়, তা প্রকাশ পায় বিজেপি প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপনে, যাতে দেখানো হয়েছে, একজন যুবতী একটি গাভীকে পরম আদরে জড়িয়ে ধরে আছে এবং এই বিজ্ঞাপনটি সেখানকার সমস্ত সংবাদপত্রে প্রচারের জন্য দেয়া হয়। যদিও মুসলমানদের লক্ষ্য করেই মূলত গো-হত্যা বিরোধী এই প্রচার, কিন্তু যদি সত্যি সত্যিই হিন্দু বাহিনীর চাপে গো- হত্যাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়, তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে হিন্দুরাই।

### কৃষক শ্রেণী

মূলত: হিন্দু কৃষকরাই অকেজো গরুগুলি ঠিকাদারদের কাছে বেচে দেয়। গো-হত্যা সম্পূর্ণ বন্ধ করার অর্থ হচ্ছে, এ সমস্ত গরুগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং এজন্য কৃষকদের প্রতিদিন প্রতি গরু পিছু একশত টাকা অথবা বছরে ছত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা খরচ করতে হবে। বর্তমানে এই কৃষি সংকটের সময়ে একজন কৃষকের পক্ষে কি এই টাকা খরচ করা সম্ভব? সরকার কি এদের জন্য গরু পালন ভর্তুকি দেবে? পশু গণনার তথ্য অনুযায়ী, মালিকরা যে সমস্ত গরুকে ছেড়ে দেয়ার ফলে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে ধরণের গরুর সংখ্যা তিপ্পান্ন লক্ষ।

যদি হিন্দুত্ব বাহিনীর দাবি অনুযায়ী সমস্ত গুরুকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, তবে তার জন্য অতিরিক্ত হাজার হাজার হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এই খাতে বছরে প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হবে। এই অর্থের পরিমাণ উপজাতি কল্যাণে সাব- প্ল্যানের চেয়ে বেশি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের জন্য যে বরাদ্দ তার চেয়েও বেশি এবং প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে যে সমস্ত প্রকল্প আছে তার চেয়েও বেশি। এতে একথাই বলা যায় যে, হিন্দুত্ব বাহিনী এসব দরিদ্র কল্যাণমূলক ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়ে দিয়ে সেই বরাদ্দ অকেজো গরুকে সংরক্ষণের জন্য ব্যয় করতে চায়।

যাহোক, " গো মাতা বাঁচাও" প্রচারের ভড়ং এর মুখোশ তখনই খসে পড়ে, যখন দেখা যায়, অনাহারক্লিষ্ট গরুগুলি ক্ষুধা নিবারণের জন্য বিষাক্ত বর্জ্যগুলি খাচ্ছে। গরু বিক্রির বাজার সঙ্কোচিত হবার ফলে ধারণক্ষমতার চেয়েও বেশি হয়ে যাওয়ায় গো- শালাগুলির অবস্থা শোচনীয়।

## চর্ম শিল্প

কৃষকদের সাথে সাথে কাঁচামালের সরবরাহ ভয়ংকরভাবে কমে যাবার কারণে সমস্ত ধরনের চর্ম শিল্পে সংকট সৃষ্টি হবে। কাউন্সিল অব লেদার এক্সপোর্টের তথ্য অনুযায়ী এই একটি শিল্পে ২০০৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বার্ষিক প্রবৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা আট দশমিক দুই শতাংশ এবং বাৎসরিক ব্যবসায়ের আর্থিক পরিমাণ হচ্ছে সাত দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার। এই শিল্পের প্রবৃদ্ধির প্রধান কারণ হচ্ছে দেশে কাঁচামাল হিসাবে উন্নতগুনমান সম্পন্ন গাভী ও বলদের চামড়ার অফুরন্ত যোগান। পৃথিবীর মোট একুশ শতাংশ গরু মোষের বাসস্থান এই ভারতবর্ষ। অথচ সংঘ পরিবারের অবিবেচক প্রচারের কারণে এ দেশেই চামড়ার যোগানের অভাবে চর্ম শিল্প ধুঁকছে। ভারতে চামড়া প্রধানত জুতা, ব্যাগ, বেল্ট, জিন এবং কিছু চামড়ার আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বের চামড়ার বাজারে, বিশেষ করে ইউরোপে রপ্তানির ক্ষেত্রে, ভারত চীনের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। চামড়ার যোগান কমে যাওয়ায় রপ্তানির পরিমাণ ভয়ানকভাবে কমে গেছে। অবশ্য বর্তমান মন্দা রপ্তানি কমে যাবার প্রধান কারণ হলেও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এই শ্লথতার কারণ হচ্ছে চামড়ার যোগানের অভাব।

এই শিল্পে দুই দশমিক পাঁচ মিলিয়ন শ্রমিক কাজ করছে। এদের প্রধান অংশই হচ্ছে তপশিলী জাতি সম্প্রদায় ভুক্ত। অনুমান প্রায় আট লক্ষ দলিত অংশের মানুষ মৃত পশুর চামড়া ছাড়িয়ে দৈনিক খাদ্যের যোগাড় করে। প্রচলিত আইনের পরিধির মধ্যেই এই কাজ। কিন্তু হিন্দুত্ববাহিনীর নজরদারি এবং গুজব ছড়ানোর কারণে চামড়া ছাড়ানোর কাজে যুক্তরা প্রচন্ডভাবে ভীত হয়ে পড়েছে কারণ তাঁরা আক্রমণের সম্মুখীন। একই সাথে ঠিকাদার, ট্রাক গাড়ির চালক, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য যারা চর্ম শিল্পের সাথে যুক্ত, তারা সবাই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কানপুরের চামড়ার কারখানার একজন মালিক বললেন, " এখন চামড়া ছাড়ানো কিংবা গরুর



চামড়া নিয়ে কাজ করা অনেকটা বাঘের চামড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করার মতো নিষিদ্ধ কাজ। কেউ মৃত গরুর চামড়া ছুঁতে চায় না। এরা এত ভীত হয়ে পড়েছে।" ক্ষমতাসীনদের মদতে এই সন্ত্রাসমূলক প্রচার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহসহ সমগ্র চর্ম শিল্পকেই সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই অঞ্চলে চর্মশিল্পের সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে কানপুরের পেশ বাগ চামড়া মণ্ডি, যেখানে প্রতিদিন প্রায় দেড়শত চামড়া বোঝাই ট্রাক আসতো, বর্তমানে সেখানে দৈনিক তিন থেকে চার ট্রাক চামড়া আসে।

চামড়া প্রক্রিয়াকরণের কারখানাসহ ছোট ও মাঝারি চামড়ার তৈরি সামগ্রির কারখানাগুলি, যেখানে প্রধানত দলিতরা কাজ করছে, সেই কারখানাগুলি চামড়ার যোগানের অভাবের কারণে শ্রমিক ছাঁটাই করছে। যেখানে দেশে চামড়া ছাড়ানোর কারখানাগুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়ে জীবিকা নির্বাহে সংকটগ্রস্ত, সেখানে সরকার আমদানি শুল্ক শূন্যে নামিয়ে বিদেশ থেকে বলদ ও গাভীর চামড়া আমদানি করছে। " মেক ইন ইন্ডিয়ান নতুন্ ভাষ্য হচ্ছে বিদেশি স্বাগত, স্বদেশি বিদায় নাও।

## খাদ্য হিসাবে গো-মাংস

মাংস প্রস্তুতকারী শিল্প, বিশেষ করে কষাই এবং মাংস রপ্তানিকারীরাও প্রচণ্ডভাবে সংকটের সম্মুখীন। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই জীবিকার সংকটে ভুগছে।

মুসলমানরাই মূলত গো-মাংস খায় এধরনের প্রচার হচ্ছে নির্জলা মিথ্যা প্রচার।

হিন্দুরা গো- মাংস খায় এ ধরনের বক্তব্য রাজনৈতিক কারণে হয়তো লালু প্রসাদ যাদব প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন, তা সত্য। দলিত সমাজের একটা অংশ, আদিবাসী এবং বিভিন্ন রাজ্যে ও বিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ গরুর মাংস খায় এবং যাদের মিলিত সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে বেশি। এন এস এস ও'র অনুমান অনুযায়ী দেশে প্রধানত দলিত, উপজাতি সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষরা, গরু বা মোষের মাংস খায় এবং তাদের মিলিত সংখ্যা পাঁচ দশমিক দুই কোটির বেশি।

গো- মাংস খাওয়ার পেছনে একটা শ্রেণি ও জাতপাতগত বিশেষ দিকও

আছে, যা আর এস এস গোপন রাখে। গো- মাংসের বিরুদ্ধে তাদের প্রচার দেশের মধ্যে অগ্রহণযোগ্য খাদ্য নির্দেশিকা জারি করতে চাইছে। একই সাথে, এর ফলে সস্তা দামে খাদ্য প্রোটিন পুষ্টি গ্রহণ করার সুযোগ থেকে গরীবদের বঞ্চিত করার প্রশ্নে প্রত্যক্ষ আঘাত হানছে।

হিন্দুত্ব বাহিনী মোষের মাংস রপ্তানি করা আইনগতভাবে অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও এই মাংসকেও বে-আইনিভাবে হত্যা করা গরুর মাংস বলে ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা প্রচার করে চলেছে।

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে তথাকথিত, ' গোলাপী বিপ্লব" সম্বন্ধে যে বক্তব্য রাখা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা । কারণ বিপরীতে, নির্বিচারে গো-হত্যা হয়ে চলেছে বলে বাজারি কথাবার্তা ছড়ানো হচ্ছে। ২০১২ পশু গণনায় দেখা গেছে ভারতে ২০০৭ সালের গণনার চেয়ে গরুর সংখ্যা শতকরা ছয় দশমিক দুই শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে ভেড়া, ছাগল ও শূকরের সংখ্যা কমেছে। এই তথ্য নির্বিচারে গো-হত্যা হচ্ছে প্রচারকে মিথ্যা প্রমাণ করছে। আসল কথা হচ্ছে, বিভিন্ন রাজ্যে মোষের মাংসকেও গো-মাংস বলা হয়, শুধু গরুর মাংসকে নয়। প্রধান রপ্তানি পণ্য হচ্ছে মোষের মাংস। কিন্তু আর এস এস গো-মাংসকে কেন্দ্র করে যে আবেগ তৈরি করতে চায় তাতে মোষের মাংসজনিত সত্য তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে না।

## আইনি ব্যবস্থা

ঘৃণা ছড়ানোর প্রচারের পাশাপাশি একথা ও বলা হচ্ছে যে, যেহেতু ভারতে এর বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেবার জন্য আইনি সুযোগ নেই, তাই এধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। এই বক্তব্যও সম্পূর্ণ মিথ্যা। পশু বিভাগের ওয়েভসাইটে দেখা যায় একমাত্র উত্তর-পূর্ব-ভারতের রাজ্যগুলি ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে কোন না কোনভাবে গো-হত্যার বিরুদ্ধে আইন আছে। কিন্তু আর এস এসের নেতৃত্বে সংঘ পরিবার এতে সন্তুষ্ট নয়। এর পেছনে কারণ কি?

অনেক রাজ্য আছে সেখানে কর্মক্ষম ও অকর্মক্ষম গরু ভাগ করা হয়। যে গাভী, বলদ বা ষাঁড় নির্দিষ্ট বয়সের সীমা পার করে যায় এবং দুধ দিতে পারে না, কিংবা কৃষি কাজেও সহায়তা করতে পারে না সে ধরনের গরু বলদ বা ষাঁড়কে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদন নিয়ে হত্যা করা যায়। যে সমস্ত রাজ্যে, সরকারি ওয়েভ



সাইটের তথ্য অনুযায়ী, " হত্যার জন্য যোগ্য" এই শংসা পত্র নিয়ে 'অকেজো গরু' কে হত্যা করা আইনত সিদ্ধ, সেই রাজ্যগুলি হচ্ছে অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, বিহার, গোয়া, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। তবে বয়সের সময়সীমা সর্বত্র একরকম নয়, পার্থক্য আছে। যেমন কেরালাতে দশ বছর আবার মধ্য প্রদেশে পনের বছর। বাংলা, তামিলনাড়ু এবং কেরালাতে দুধ দেয় না এমন গরুকে হত্যা করা যায়।

ভারতে এ ধরনের আইন কোন বিচিত্র বিষয় নয়। পাঠকরা জেনে বিস্মিত হবেন যে, পাকিস্তানে কিছু প্রদেশ আছে, যেমন পাঞ্জাব, যেখানে গরু, বলদ বা উঠ এ ধরনের পশু যেগুলি দুধ দেয় বা দেয় না, তাদের হত্যার বিরুদ্ধে কড়া আইনি নিষেধাজ্ঞা আছে। ইরানেও এধরনের আইন আছে। সমাজতান্ত্রিক কিউবাতে দুধ দেয় বা দুধ দেয়া বন্ধ করেছে এমন গরু বা মোষ হত্যার বিরুদ্ধে আইন আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছে।

কিউবা সরকার সাত বছরের নীচে শিশুদের দুধ এবং বিদ্যালয়ে পড়াকালীন সমস্ত পড়ুয়াদের দই বিনামূল্যে দিয়ে থাকে, সেজন্য দেখা গেছে যদি খাদ্য হিসাবে গরু মোষ হত্যা করা হয় তবে সেই কর্মসূচী ব্যাহত হবে। যাহোক, কিউবাতেও যে সমস্ত গরু মোষের অর্থনৈতিক উপযোগিতা শেষ হয়ে গেছে সেগুলিকে হত্যা করা হয়।

## আম্বেদকরের সমঝোতামূলক সূত্র

ভারতবর্ষে হিন্দুত্ববাদী শক্তির আরও একটি কর্মসূচী আছে। তাদের যুক্তি পাকিস্তানে যেহেতু কোরানের নিষেধাজ্ঞা অনুসারে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ সেজন্য একই ধর্মীয় কারণে ভারতে কেন গো-মাংস খাওয়া অথবা গো-মাংস রাখা নিষিদ্ধ হবে না। এ ধরনের বক্তব্য আসলে ভারতকে আরেকটি হিন্দু পাকিস্তানে পরিণত করার অপপ্রয়াস। বর্তমানে চালু রাজ্য আইনগুলি বাতিল করে একটি কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমস্ত ধরনের পশু হত্যা এবং একে গো- মাংস খাওয়ার সাথে যুক্ত করে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য আর এস এসের দাবির

মধ্যেই তা প্রতিফলিত হয়। আর এস এসের এ ধরনের দাবির পেছনে রয়েছে সংবিধান সভায় গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার দাবির বিরুদ্ধে আম্বেদকরের প্রতিরোধ ভূমিকায়।

আম্বেদকর জাত-পাত ব্যবস্থাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করার পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কি কারণে দলিতদের অশুচী বলে গণ্য করে তারও ব্যাখ্যা দেন। সে সব কারণের একটি হচ্ছে দলিতরা মৃত পশু ও গরুর মাংস খায়। সেজন্য উচ্চবর্ণের লোকেরা দলিতদের অপবিত্র বলে মনে করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার দাবির পেছনে রয়েছে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের উপর হিন্দুত্ববাদীদের উচ্চ বর্ণের আধিপত্য চাপিয়ে দেয়া।

সংবিধান সভার অনেক সদস্য গো- হত্যা জাতীয় পর্যায়ে নিষিদ্ধ করার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেবার দাবিতে সোচ্চার হয়। পাশাপাশি এই দাবির বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যাও কম ছিল না। এই অবস্থায় আম্বেদকর একটি সমঝোতা সূত্রের বিধান দেন যা সংবিধানে যুক্ত করার পরিবর্তে সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ৪৮ অনুচ্ছেদ হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে।

গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার দাবির একজন কট্টর দাবিদার পন্ডিত ঠাকুর দাস ভার্গব সংবিধান সভার বির্তক সম্পর্কে বলেন, " এই সংশোধনী উত্থাপনের মধ্যে বলতে কোন দ্বিধা নেই, আমি এবং আমার মতো যারা, ডঃ আম্বেদকরের ও অন্যান্যরা যে যুক্তি তুলে ধরেছেন, তার সাথে সহমত পোষণ করিনা, বরং এ ধরনের বক্তব্যের সমর্থন করাকে বলা যেতে পারে নিজের বুদ্ধি বিবেচনাকে বলি দেয়া। শেঠ গোবিন্দ দাস মৌলিক অধিকারে যুক্ত করার জন্য একটি সংশোধনী জমা দেন। তাঁর সাথে সাথে অন্য সদস্যরাও এ ধরনের সংশোধনী পেশ করেন। আমার মনে হয় , এই সংশোধনীগুলি মৌলিক অধিকারের মধ্যে যুক্ত করে নিলে ভাল হতো, কিন্তু সংবিধান সভার অন্যান্য বন্ধুরা তার বিরোধিতা করেন, এই অবস্থায় ডঃ আম্বেদকরের ইচ্ছা এই সংশোধনীর বিষয়বস্তুকে মৌলিক অধিকারের মধ্যে যুক্ত না করে, নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে যুক্ত করা হোক। আসলে সংবিধান সভার সর্বসম্মত মতামত ছিল যে, এই সমস্যা এমনভাবে সমাধান করা হোক যাতে সমস্যারও সমাধান হবে আবার একে বলপূর্বক চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বলে



মনে হবে না। আমি নিজে পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের পদক্ষেপ নেই, যা আমার মতে, যদি মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির মাঝামাঝি কোন একটা সিদ্ধান্ত নেয়া যায় তবে আমাদের উদ্দেশ্যে সফল হবে এবং অন্যদিকে অহিন্দুরাও একথা বলতে পারবে না যে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে জোর করে সহমত আদায় করা হয়েছে।"

আসল কথা এমন নয়। শুধু অহিন্দুরাই নয়, হিন্দুদেরও একটা বিরাট সংখ্যা গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার জন্য জাতীয় স্তরে কোন নিষেধ করার বিধান রাখার বিরোধিতা করেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮ এ বলা হয়েছে, " রাজ্যগুলি কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং পশু সংরক্ষণ ও তাদের উন্নত প্রজননেরও উদ্যোগ নেবে, সাথে সাথে গরু, বাছুর ও দুধ দেয় বা দুধ দেয় না এমন অন্যান্য পশু হত্যা নিষিদ্ধ করবে।"

আম্বেদকরের এই সমঝোতা সূত্র এ বিষয়ে ধর্মীয় তাৎপর্যকে বাইরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। নির্দেশাত্মক নীতিতে গো- মাংস খাওয়া সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি। তাই আর এস এস এই নির্দেশনাকে প্রতিবাদ জানিয়ে এর পরিবর্তন দাবি করছে।

## আর এস এস - বিজেপির প্রয়াস

মদনলাল খুরানার নেতৃত্বে গঠিত দিল্লির বিজেপি সরকার ১৯৯৪ সালে গো- মাংস খাওয়াকে ফৌজদারি আইনের আওতায় আনে। ১৯৯৪ এর বিধানে একথাও বলা হয় যে, অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হবে যে সে গো মাংস খায় নি। এই দানবীয় আইনকেই হাতিয়ার করে সম্প্রতি কেরালা ভবনের রান্নাঘরে দিল্লি পুলিশ গো-মাংস রান্না করা হচ্ছে কিনা নিয়ে অভিযান সংগঠিত করে। অভিযানে গো-মাংসের বদলে মোষের মাংস পাওয়া যায়। ২০০৫ সালে মোদির নেতৃত্বে গুজরাটে গো- হত্যা ও গরুর মাংস রাখা সম্পর্কে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

কেন্দ্রের ক্ষমতায় বিজেপি শাসন প্রতিষ্ঠার পর হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রাজস্থান, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খন্ডের মতো রাজ্যগুলি

গো-মাংস রাখা এবং খাওয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারির উদ্দেশ্যে রাজ্যের চলতি আইনের সংশোধন অথবা নতুন আইন চালু করেছে। আর এস এস এবং বিজেপি উচ্চ নেতৃত্বের নেতৃত্বেই এই আগ্রাসন চলছে। পশু হত্যা নিষিদ্ধ করার জন্য জাতীয় আইন প্রণয়নের জন্য আর এস এস সারা দেশেই প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদীরা আম্বেদকরের সূত্রকে বদলে " হত্যাযোগ্য" এই কথাটি তুলে দিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার বিধান তৈরি করে একে গো-মাংসের সাথে যুক্ত করতে চাইছে। জাতীয় আইনের কোন প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে মোদি সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ কিংবা বিষয়টি সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার যে কোন প্রচেষ্টার প্রবল প্রতিরোধ করা হবে। এই লড়াই শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার লড়াই নয়, এ লড়াই শুধুমাত্র কৃষকদের জীবন জীবিকা রক্ষার লড়াই নয়, দলিত কিংবা দরিদ্র সাধারণের স্বার্থ রক্ষার লড়াই নয়, এ লড়াই হচ্ছে ভারতবর্ষকে একটি "হিন্দু রাষ্ট্র"- এ পরিণত করার বিরুদ্ধে লড়াই।



# আর এস এস ও দেশি গরু

## ইন্দরজিৎ সিং

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি দল একক ক্ষমতায় কেন্দ্রে সরকার গঠনের পর আর এস এস এবং এর সহযোগী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলি বিগত কয়েকমাস ধরে ভয়ংকর আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। লম্বা চওড়া মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া এবং দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধী পরিস্থিতি সত্ত্বেও বিজেপি মাত্র একত্রিশ শতাংশ নির্বাচকের সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু সেই সমর্থনেও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের বিশেষ করে, অবর্ণনীয় সংকটে দেশের কৃষক সমাজ জর্জরিত, এর সাথে যুক্ত হয়েছে নয়া-উদারবাদী নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি কারণে সেই একত্রিশ শতাংশ জনসমর্থনেও এখন ভাঁটার টান। এই অবস্থায় বিজেপি তার হিন্দুত্ব বাহিনীকে সমস্ত ধরণের বিভেদকারী ও ভাবাবেগ সংক্রান্ত বিষয় যার সাথে ধর্মের যোগসূত্র আছে বা জাত-পাত প্রভৃতি নিয়ে লেলিয়ে দিয়েছে। গরুও এর মধ্যে একটি বিষয়। জাত কিংবা ধর্মীয় সীমারেখার বাইরে গরু এখনও উত্তর ভারতে পূজা পেয়ে থাকে। বিজেপি আগেও ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করতে বিশেষ করে, মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এমন কি দলিতদেরও এই বৃত্তের মধ্যে রেখে, বিভিন্ন সময়ে ও নির্বাচনের আগে গরুকে কেন্দ্র করে যে আবেগ রয়েছে, সেই ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করেছে।

সম্প্রতি দাদরির (ইউ পি) বিশারী গ্রামে ঠাণ্ডা মাথায় মোঃ আখলাকের খুন তেমনি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের একটি ধ্রুপদী উদাহরণ। তাঁর বাড়িতে গো-মাংস আছে এই গুজব ছড়িয়ে দেয়া হলো। গো-হত্যার অভিযোগ এনে হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরেও দু' দুটো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে অত্যন্ত ভয়ংকর বিবৃতি দিয়ে বললেন, মুসলমানরা এদেশে তখনই

থাকতে পারবে যদি তারা গো- মাংস খাওয়া বন্ধ করে। এ ধরণের বক্তব্য গত এক বছর আগে যে শপথ নিয়ে তিনি মন্ত্রী হয়েছেন, সেই শপথের অবমাননা। কাজেই গো- হত্যা কিংবা গো-মাংস খাওয়াকে কেন্দ্র করে এ সমস্ত ঘটনা ও বিতর্কের আলোকে কিভাবে " উন্নয়নের" কর্মসূচীর বদলে গরু সেই স্থান দখল করেছে, তা দেখতে হবে। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যেভাবে ধারাবাহিক ও ঔদ্ধত্যের মাধ্যমে ঘৃণা এবং অসহিষ্ণুতা সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করার উদ্যোগ চলেছে, সেই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে দেখতে হবে। তাই, এই অবস্থায়, গরু এবং পশু সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়টির যথার্থ বিশ্লেষণ করা বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রয়োজন।

অর্থনীতিতে গরুর গুরুত্ব বিবেচনায় হিন্দী ভাষী অঞ্চলকে গো- বলয় বলে ডাকা হয়। কৃষি কাজ বলদের উপর নির্ভরশীল কারণ দুধ দিতে সমর্থ গরু চাষ এবং পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয় না; অন্যদিকে গাভী দুধ জাতীয় পণ্য উৎপাদনের মূল উৎস, তাছাড়া বাচ্চাও প্রসব করে। কাজেই কৃষিকাজে গরু হচ্ছে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায় কৃষক সাধারণের জীবন জীবিকা নির্বাহের প্রধান সহায়তাকারী। ষাঁড়ের যত্ন করা (গরু এবং মোষ উভয়েই) এবং প্রজনন সেজন্য সব সময়েই গ্রামীণ সমাজে এমন কি শহরেরও কোন কোন অংশে গুরুত্বপূর্ণ একটি পেশা হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে এবং বর্তমান সময়েও তা অব্যাহত। কাজেই সাধারণভাবে পশু এবং বিশেষভাবে গরু বলদের জন্ম দেবার কারণে 'গো-মাতা' হিসাবে পূজ্য হিসাবে গণ্য হয়েছে। গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের কাছে একটি জনপ্রিয় শ্লোগান হচ্ছে " গো- মাতা কি জয়।" এই অঞ্চলে গো-পূজা নিয়ে আর্য সমাজের আন্দোলনও এ ধরণের ধারণা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। একজন মানুষ তার প্রকৃত মা বা গরু অথবা ষাঁড়ের নামে শপথ নিচ্ছে— এ ধরনের বিষয় অবিশ্বাস্য নয়। একটি পুরুষ গরুর জন্মকে সৌভাগ্য হিসাবে এবং গাভীর জন্ম হলে তা অভিশাপ বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে মোষের বেলায় বিষয়টা ঠিক বিপরীত। কিন্তু দীর্ঘ বছরে সমস্ত চিত্রের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে।

কৃষিক্ষেত্রে দ্রুত যন্ত্রায়ণ ঘটার কারণে, বিশেষ করে 'সবুজ বিপ্লব' এর



সময়ে ট্রাক্টর এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি, চাষের কাজে বলদের ব্যবহার ভয়ানক ভাবে কমিয়ে দিয়েছে। বর্তমান সময়ে বলদ দিয়ে জমি চাষ করা হচ্ছে, এমন দৃশ্য খুবই বিরল। মোষ গরুর স্থান দখল করেছে। অন্যদিকে বলদের জায়গা দখল করেছে ট্রাক্টর। পুরুষ মোষ পরিবহন এমন কি চাষের কাজেও অত্যন্ত দ্রুত বলদের স্থান দখল করেছে।

'হরিয়ানার 'মুরা' জাতির মোষ প্রচুর দুধ দেবার জন্য খুব বিখ্যাত। এই জাতীয় মোষ দক্ষিণ ভারতেও নেয়া হয়েছে। চলতি এই কৃষি সংকটে কৃষকরা চাষবাসের কাজে প্রতিকূলতার মুখোমুখি। এই অবস্থায় মোষের দুধ উৎপাদনের মাধ্যমে কয়েক দশক ধরে দেশের একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করছে। কারনাল জেলায় একটা 'মুরা' জাতির পুরুষ মোষের বাজার দর ছয় কোটি টাকা উঠা সত্ত্বেও কৃষক এই মোষটি বিক্রি করতে রাজি নয়। এতেই গরুর চেয়ে মোষের অগ্রাধিকার কোন পর্যায়ে তা বোঝা যায়।

গত চার দশকে হরিয়াণাতে গরুর সংখ্যা কমেছে। ১৯৬৬ সালে যেখানে সমস্ত ষাঁড় জাতীয় পশুর মধ্যে গরুর সংখ্যা ছিল শতকরা চল্লিশ দশমিক নয় শতাংশ, ২০০৭ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র শতকরা চৌদ্দ শতাংশে। অন্যদিকে একই সময়ে মোষের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ দশমিক সাত শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে শতকরা ঊনসত্তর শতাংশ। এই বৃদ্ধির পেছনে কারণ হচ্ছে মোষের দুধ অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক সহায়ক। সাধারণভাবে গড়ে একটি গরু থেকে দুই দশমিক নয় কিলো দুধ পাওয়া যায়, আর মোষ থেকে পাওয়া যায় চার কিলো। ছয় কিলো দুধ এবং এই দুধে মাখনের পরিমাণ অনেক বেশি।

দ্বিতীয়ত, যুগ যুগ ধরে যে দেশি গরু ছিল, বর্তমানে সংকর জাতীয় গরু প্রজননের ফলে সেই দেশি গরুর কদর আর নেই। সংকর জাতীয় গরুর মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে, শাহীওয়াল অথবা জার্সি অথবা হোলস্টেইন ফ্রিসিয়াল প্রভৃতি। কাজেই দেশি গরুর সংখ্যা গৃহপালিত পশু হিসাবে কমতে থাকে। এগুলিকে শুধু দেশি ষাঁড়ের মাধ্যমে প্রজনন কাজে লাগানো হয়। রাস্তাঘাটে বেদম ঘুরে বেড়ানো গরুর মধ্যে এদের সংখ্যাই বেশি। এই রাস্তাঘাটে চড়া গরু গ্রামাঞ্চলে

শষ্যের ক্ষতি করছে অন্যদিকে শহরে সড়ক দুর্ঘটনার কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে। মজার বিষয় হচ্ছে, এই গরুগুলিই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, আবার এগুলিকেই 'পূজা' করা হচ্ছে। এধরনের গরুকে বিরাট গো-শালা বানিয়ে তাতে রাখা হয়, যে গো- শালাগুলি সুবিধাবাদীদের অর্থ উপার্জনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কারণ মানুষ গো- শালা কমিটিকে অর্থদান করে এবং এমন কি বর্তমান দশকগুলিতে অনেক রাজ্য সরকারও রেজিষ্ট্রিকৃত গো-শালা কমিটিগুলিকে অকাতরে অনুদান দিচ্ছে। সেখানে রাস্তাঘাটে চড়া গরুকে রাখার জন্য গো-শালা কমিটিকে মোটা টাকা দেয়া হয়। তবেই তারা সেই গরুকে গো-শালায় স্থান দেয়। তবে গরুটি যদি দুধেল হয় কিন্তু দুধ দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে, এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষ সেগুলিকে রাতের বেলায় আবার গো- শালার বাইরে ছেড়ে দেয়।

বাস্তবক্ষেত্রে এদের উপযোগিতা সীমিত হয়ে গেলেও রাস্তাঘাটে বেদম ঘুরে বেড়ানো গরু ও ষাঁড়ের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলায় সাধারণ মানুষের কাছে মারাত্মক দুর্ভোগের কারণ দাঁড়িয়েছে। এইসব রাস্তাঘাটে চড়া গরুর কারণে অনেক পথচারীর মৃত্যু হচ্ছে অথবা দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে এবং এর ফলেই প্রায়শই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। গ্রামাঞ্চলে বেদম চড়া ষাঁড় শুধুমাত্র ফসলেরই ক্ষতি করে না, এদের উগ্রতার ফলে মূল্যবান গর্ভবতী মোষের অকাল প্রসবও ঘটছে।

এক গ্রাম থেকে পাশের অন্য গ্রামে মালিকবিহীন এধরনের গরু চড়ে বেড়ানোকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামের সংঘর্ষের খবরও পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে দুটো গ্রামের সংঘাত লক্ষ্যণীয়ভাবে স্পষ্ট, তাহলো, একদিকে এসব গরুর কারণে যে চাষীর ফসলের ক্ষতি হচ্ছে তার স্বার্থ, আর অন্যদিকে হচ্ছে তথাকথিত গো-ভক্তমণ্ডলী এবং তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক স্বার্থ।

রোগ, অনাহার, ঠান্ডা অথবা দুর্ঘটনাতে এই লক্ষ লক্ষ রাস্তাঘাটে চড়ে বেড়ানো গরুর মৃত্যু বেশি মাত্রায় যে হবে তা অবধারিত। এধরণের মৃত অথবা আহত গরু অনেক সময়েই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কিংবা দলিতদের বিরুদ্ধে একটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।



কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়াই গরুর মেলা বন্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থায়, গরুকে এক জায়গা থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবার সময় বিভিন্ন নামে ছড়িয়ে থাকা " গো- ভক্তের' ভড়ংধারী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি এগুলিকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই কথা ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরি করে। এমনকি পুলিশও অনেক সময় এদের সাথে যোগ দেয়। তাছাড়া তোলা আদায়কারীরা তো আছেই। কুখ্যাত দুলিনার ঘটনার স্মৃতি এখনও তাজা। ২০০২ সালে হরিয়ানার ঝজ্জুর শহরে একদল সাম্প্রদায়িক জনতা পরিকল্পিতভাবে পাঁচজন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে খুন করেছিল।

সারা ভারত কৃষক সভা গোটা দেশ জুড়ে বিভিন্ন রাজ্যে রাস্তায় চড়ে বেড়ানো বেদম গরুর সংখ্যা কমাবার জন্য আন্দোলন করে আসছে। কৃষকরা এসমস্ত গরুর প্রজনন ক্ষমতার উন্নতি ঘটিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা, গো- মেলা চালু করা, বেদম গরুগুলিকে গো-শালায় রাখার ব্যবস্থা করাসহ সাম্প্রদায়িক শক্তির দাপট কমাবার জন্য দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর, হরিয়ানাতে গরুকে কেন্দ্র করে আরও উগ্রভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ ঘটে চলেছে।

২০১৫ সালের ১৬ মার্চ হরিয়াণা বিধানসভায় " হরিয়ানা গো-বংশ সংরক্ষণ ও সম্বর্ধন আইন " নামে একটি রাজ্য আইন গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে তথাকথিত সংরক্ষণের নামে গরুকে আহত করলে অথবা হত্যা করলে কারাবাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গো- শালা তৈরি করার জন্য এন জি ও-গুলিকে গ্রামে জমি দেয়া হবে এবং তাছাড়াও সরকার তাদের জন্য ঢালাও হারে অনুদান বরাদ্দ করবে। এর সুযোগ নিয়ে সুবিধাবাদীরা তাদের আর এস এস যোগাযোগকে হাতিয়ার করে সর্বসাধারণের ব্যবহৃত জমি গরুর নামে জবর দখল করে নিচ্ছে। এ সম্পর্কে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সর্ব সাধারণের জমি এক তৃতীয়াংশ তপশিলী জাতিদের জন্য চাষ বাস করা অথবা ভূমিহীন তপশিলীদের বাড়ি ঘর তৈরি করার জন্য রেখে দেয়া বাধ্যতামূলক।

কয়েক মাস আগে হরিয়াণার রোহটক মহাঋষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ' গো-

বংশের' অবস্থা সম্পর্কে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সেমিনারে হরিয়াণা সরকারের কৃষি মন্ত্রী শ্রী ও পি ধ্যানকর একজন গুরুত্বপূর্ণ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ধ্যানকর ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় বাবা ও স্বামীজীরা মঞ্চ আলোকিত করে বসেছিলেন। সেমিনারে মন্ত্রী একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন, যাতে দেশি গরু নিয়ে ডেয়ারী গড়ে তুললে সরকার থেকে পঞ্চাশ শতাংশ ভর্তুকি পাওয়া যাবে বলে বলা হয়। এ ধরণের সিদ্ধান্ত উদ্ভট ও কান্ডজ্ঞানহীন। মানুষের আবেগ নিয়ে খেলার জন্য এধরনের কাজে যুক্তির কোন স্থান থাকে না। সংকর জাতের গরু হয় তো দেশি গরুর চেয়ে বেশি দুধ দেয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে চড়ে বেড়ানো অথবা অন্যান্য দেশি গরুকে " গো- মাতা' বলে ডাকা হবে।

# প্রাচীন ভারতে গরু

## ড: শিউ দত্ত

দাদরির বিশারী গ্রামে গো-মাংস খাওয়ার মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে মো: আখলাক নামে একজন নিরীহ মুসলমানকে হিন্দুত্ব বাহিনী যে ভাবে হত্যা করেছে, সেই ঘটনা সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক মানুষ এবং আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে আঘাত করেছে। এই ঘটনার পাশাপাশি গোহত্যাকে হাতিয়ার করে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি এবং সংখ্যালঘুদের উপর এধরনের আরও আক্রমণ ঘটে চলেছে।

আর এস এস বিজেপি'র মুখপাত্ররা এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা তৈরি করা বিভিন্ন কারণ সাজিয়ে এসব ঘটনার পক্ষে নির্লজ্জভাবে যুক্তি খাড়া করছেন। এদের বক্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হচ্ছে, তাদের দাবি, বেদে গো-মাংস খাওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং গো-মাংস ভক্ষণকারীর চরম শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য, মুসলমান আগমনের আগে ভারতে গো-মাংস খাওয়া হতো না। এধরনের দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

প্রো. আর এস শর্মা, প্রো. রোমিলা থাপার এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো ভারততত্ত্ববিদ, উনবিংশ শতাব্দিতে বাংলার নব জাগরণে যাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, এসমস্ত পন্ডিত ব্যক্তিরা প্রাচীন ভারতে গো-মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল বলে তাঁদের লেখায় উল্লেখ করেছেন। পি ভি কানে তাঁর স্মরণীয় গ্রন্থ " দি হিস্টরি অব ধর্মশাস্ত্র' বইতে এবং প্রো. ডি এন ঝা তাঁর "মিথ অব দ্য হোলি কাউ' বই এ প্রাচীন ভারতে যে গরু বলি দেয়া হতো এবং গো-মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল— সে সম্পর্কে প্রচুর তথ্য প্রমাণ দিয়েছেন।

সাহিত্য এবং প্রত্নতাত্বিক বস্তুতে এ ধরণের প্রচুর নিদর্শন আছে, যেখানে বলা হয়েছে " কুরুপাঞ্চলে " (পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, দিল্লি এবং হরিয়ানার অংশ)

ও অন্যান্য এলাকায় বৈদিক ভারতে প্রচুর সংখ্যায় গরু এবং ষাঁড় হত্যা করা হতো। বেদ পরবর্তী সময়ে সাহিত্যে গরু সহ বিভিন্ন ধরনের পশু বিভিন্ন ধরনের দেবতার কাছে বলি দেয়া হতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যেমন, ষাঁড় বা বৃষভকে ইন্দ্রের (প্রধান বৈদিক দেবতা এবং যুদ্ধ, বৃষ্টি ও বজ্রপাতেরও দেবতা) সামনে বিচিত্র ফুটফুটে রং এর গরুকে মারুতের (ঝড়ের দেবতা) সামনে এবং তামাটে রং এর গরুকে অশ্বিনী কুমারদের (সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য এবং মার্গ দর্শনের দেবতা) সামনে বলি দেয়া হতো। মিত্র (যুদ্ধে ইন্দ্রের সহকারী) এবং বরুনের (জলের দেবতা) সামনেও গরু বলি দেয়া হতো।

বেদ পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য, শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে গরুর মাংস হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য ( শ: ব্রা: ৭.১৩)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে শ্রাদ্ধের সময় একটি গরু কেটে তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রাস্তার চৌমাথা দিয়ে যাওয়া পথচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। শদবিংশ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে অনুষ্টারনী ( যে গরু তখনও দুধ দেয়) গরুকে বৈতরনী নদী পাড় করে দেয়ার জন্য প্রতিটি মৃতদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাছে রাখা হতো (শদব, ব্রা. ১.৭.১) । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে, শ্রাদ্ধের সময় শবদেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গরু দিয়ে সুন্দর করে সাজাতে হবে যাতে আগুনের শিখা থেকে সে গুলিকে রক্ষা করা যায়।

বেদ পরবর্তী অন্যান্য গ্রন্থেও সর্বসাধারণের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গরুসহ অন্যান্য পশু বলি দেয়া হতো। অশ্বমেধে বলি হিসাবে (রাজারা অন্য রাজ্য জয়, ক্ষমতা প্রদর্শন করা, বংশ রক্ষা ইত্যাদি কারণে ঘোড়া বলি দিত) গরু সহ প্রায় ছয় শত ধরনের পশু হত্যা করা হতো।

মৈত্রায়নী সংহিতাতে বলা হয়েছে, অগ্ন্যদেহ্য (আগুন প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ জ্বালানো) অনুষ্ঠানে, যা প্রতিটি সাধারণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শুরুতে অনুষ্ঠিত হয়, গো-হত্যা করার বিধান ছিল (এম এস. ১.৮.৯)। এই গ্রন্থেই আরও বলা হয়েছে 'শূলগভ' বা একটি ষাড়কে শূল বা শিকে বিঁধে হত্যা করা হতো। শুধু তাই নয়, আরও অনেক ষাঁড় হত্যা করা হতো। শতপথ ব্রাহ্মণে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, সাধারণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দক্ষিণা হিসাবে যে গরু দান করা হতো, সে গরু হত্যা



করা হতো। বলা হয়েছে, " যে কোন ব্যক্তি পুরোহিতকে এক সহস্র বা তারও বেশি গরু দক্ষিণা হিসাবে দান করতো, সে সমস্ত গরুকে হত্যা করতো। কারণ এই সহস্র বা তারও বেশি গরু দক্ষিণা হিসাবে দান করার ফলে তার সব কিছু পাওয়া হয়ে গেছে এবং সমস্ত কিছু জয় করা হয়ে গেছে। (শ. ব্রা. * ৫.১.১১-১)। এই গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে, তিনটি গরুকে হত্যা করা হয়েছে। প্রথম গরুর মাংস 'মিত্র' (যুদ্ধে ইন্দ্রের সহকারী) ও বরুনকে, দ্বিতীয় গরুর মাংস সমস্ত দেবতাকে এবং তৃতীয় গরুর মাংস বৃহস্পতিকে (দেবতাদের শিক্ষক বা গুরু) উৎসর্গ করা হয়েছে।

শদবিংশ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে নয়টি একচুক্ষু, নয়টি খোঁড়া, এবং নয়টি পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং নয়টি শিং ভাঙা গরু একত্রে দক্ষিণা স্বরূপ পুরোহিতকে দান করা হতো। এতে পরিষ্কার বলা আছে, পুরোহিত এই গরুগুলিকে হত্যা করতো (শতব : ব্রা, III ৮.২২.২৪)।

শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে বিরাট একটি ষাঁড়ের মাংস কেটে রান্না করে অবশ্যই অতিথি সৎকার হিসাবে রাজা অথবা ব্রাহ্মণকে খাবার জন্য দেয়া হতো। (শ. ব্রা. III ৪.১.২)। এই গ্রন্থে গাভী ও ষাঁড় হত্যার কথা অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। এই একই গ্রন্থে বলা হয়েছে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, যেহেতু গরুর মাংস খেলে শরীর মোটা হয়, তাই তিনি গরুর মাংস খাবেন (শ. ব্রা. III ১.২.২১) ।

মৈত্রায়নী সংহিতা অনুসারে বলা হয়েছে, প্রকাশ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যজ্ঞবেদীতে বলি দেবার জন্য সবচেয়ে ভাল পশু হচ্ছে গরু (এম এস, ১.৮.৯-১০)। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে অগ্নিস্টোম অনুষ্ঠানে বাছুর বলি দেবার উল্লেখ আছে। গোপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, বলিদানকারী বলি দেওয়া গরুর মাংস প্রতিনিধিত্বকারী পুরোহিতদের মধ্যে বিলি করবে (গো, ব্রা: * ১৮) । একই গ্রন্থের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে অগ্নিহোত্রী অনুষ্ঠানে আহুতি রূপে গরুর মাংস অর্পণ করা হবে।

অথর্ববেদ ও কৌশিক সূত্রতে গরু ও ষাঁড়সহ বহুপশুর হত্যার বিবরণ

পাওয়া যায় (আরও জানার জন্য রাজছত্র মিত্রের, হিন্দিতে লেখা " অথর্ববেদ মেঁ সাংস্কৃতিক তত্ত্ব" এই বই পড়া যেতে পারে। বইটি এলাহাবাদ থেকে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে)।

বৈদিক সাহিত্যে ( গো হত্যা সম্বন্ধীয় অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, 'গোভিকর্তা (গো হত্যাকারী), গাব্যচ্ছা ( যে গরু হত্যা করে), ' গোসড' ( গো হত্যা করে উৎসর্গকারী), ' গো যজ্ঞ' ( গরু হত্যা করে উৎসর্গ করা) ইত্যাদি। এর ফলে , এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, অনেক অনুষ্ঠানেই গরু হত্যা করে, সেই মাংস খাওয়া হতো। বেশিরভাগ বেদেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গরুসহ কিছু কিছু পশুর মাংস দেবতাকে উৎসর্গ করলে দেবতা সন্তুষ্ট হন। বিশেষ অতিথিকে গোমাংস দিয়ে ভোজন করানোর কথা বলা হয়েছে, ফলে সেই বিশেষ অতিথির নাম ' গোঘ্ন' অথবা গো হত্যাকারী। হিন্দুত্ব বাহিনী এই ' গোঘ্ন' শব্দটির অপব্যাখ্যা করছে। পাণিণীর অষ্টাধ্যায়ী হচ্ছে সংস্কৃত ব্যাকরণের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে " গোঘ্ন' বলতে গো হত্যাকারীকে বোঝায় (আট, III ৪.৭৩)।

বৈদিক আচার অনুষ্ঠান হিসাবে গো- হত্যা করা এবং গরুর মাংস যে খাওয়া হতো, তা প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের নিদর্শন অনুযায়ীও প্রমাণিত। হস্তিনাপুর (মীরাট মেলা), আল্লাপুর (বদোয়ান জেলা), সাংসুল (লুধিয়ানা জেলা), হুলাস (সাহারানপুর জেলা) এবং অত্রন্পিফেরা (এটোয়া জেলা) প্রভৃতি জায়গায় খননের ফলে বিরাট পরিমাণে গরু ও ষাঁড়ের হাড় পাওয়া গেছে যেগুলির মধ্যে গভীরভাবে কাটার চিহ্ন আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে বৈদিক যুগের মানুষেরাই এগুলিকে খাবার জন্য হত্যা করেছিল এবং গো মাংস পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে তারা গ্রহণ করতো। বহু রং এ চিত্রিত বিখ্যাত ছাই রং এর মাটির পাত্রের ভিতরে বিক্রির জন্য এগুলি রাখা ছিল। বৈদিক পরবর্তী যুগেও তা অব্যাহত ছিল ( যখন সমস্ত বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়)।

খৃঃ পূঃ ৬ থেকে ৪ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে যে গো-হত্যা এবং গরুর মাংস খাওয়া হতো, তা বেদ পরবর্তী পালি সাহিত্যে সেই বিষয়ের উল্লেখের মধ্যেও প্রমাণিত। 'মজঝিমা নিকয়" তে পারদর্শী গো- হত্যাকারীর বর্ণনা আছে (ম. নি.



III ১৫৩)। 'সুত্তনিপাত' তে উল্লেখ আছে হাজার হাজার গরু উৎসর্গ করার জন্য হত্যা করা হতো (সত্তপ : VII ১.১৫৪)। অন্য একটি পালি গ্রন্থে বলা হয়েছে, " রাজা 'ইক্ষ্বাকু একটি উৎসর্গ অনুষ্ঠানে কয়েক শত গরু হত্যা করেছিলেন।... রাজা গরুগুলির শিং ধরতেন এবং তারপর এগুলিকে হত্যা করতেন (ব্রা. ধম্মিকা সুত্ত ১.৪.২৫)।

উপরোক্ত তথ্যগুলি অখন্ডনীয়ভাবে প্রমাণ করছে যে, প্রাচীন ভারতে উৎসর্গ করার জন্য গো- হত্যা করা এবং সেই উৎসর্গীকৃত গরুর মাংস খাওয়া হতো। এসমস্ত তথ্য গোপন করে আর এস এস - বিজেপি যে তাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থবাহী কর্মসূচী অনুসারেই ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে মিথ্যা বাগাড়ম্বর করছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

এর কয়েকশত বৎসর পরে, বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে ধীরে ধীরে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হতে থাকে। এর প্রধান কারণ, পশুচারণ জীবন থেকে খৃ: পূ: ৭ম শতাব্দী নাগাদ স্থায়ী কৃষিভিত্তিক জীবনে পরিবর্তন। লোহার ফলা লাঙ্গল সহ লোহার যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা এই রূপান্তরের কারণ। ফলে চাষের কাজ কর্মে ষাঁড় ও গরু কৃষি কাজে স্বাভাবিক উপাদান হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। সেই সময় থেকে বড় সংখ্যায় গো- হত্যা অথবা গরুর মাংস খাদ্য হিসাবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ রইলো না। কিছু ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে এই পরিবর্তনের তথ্য পাওয়া যায়। এইভাবে, শতপথ ব্রাহ্মণ (১ম ভাগ, পরিচ্ছেদ ১-৩, ৬-৭) ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গো-মাংস উৎসর্গ করার পরিবর্তে চাউল এবং বার্লি উৎসর্গ করার কথা বলে। শতপথ ব্রাহ্মণের এই উল্লেখই হচ্ছে পশুচারণ জীবন থেকে কৃষি ভিত্তিক জীবনে রূপান্তরের প্রথম উল্লেখ। স্বত্ত নিপাতে ব্রাহ্মণধম্মিকা সূত্ত অনুসারে (খৃ: পূ: ৪র্থ শতাব্দীর বৌদ্ধ সাহিত্য- বারাণসী সংস্করণ, পরিচ্ছেদ ১২, পৃ: ৭৪) বুদ্ধদেব গো রক্ষার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণিক সময়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন, " তাঁরা উৎসর্গ অনুষ্ঠান করতো, সেই অনুষ্ঠানে গরুও উপস্থিত থাকতো। মা, বাবা ভাই অথবা অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের মতো

গরুও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু, কারণ এদের মাধ্যমেই শষ্য উৎপাদন হয়। পশু এবং বিশেষ করে গরু আমাদের দুধ দেয়। শক্তি, সৌন্দর্য এবং সুখ প্রদান করে। বুদ্ধদেব আরও বলেন, যেহেতু ব্রাহ্মণরা এই সত্য এখন বুঝতে পেরেছেন,তাই তাঁরা গো-হত্যা করেন না। খৃ: পূ: প্রায় ৫ম শতাব্দীতে জৈন গ্রন্থ উত্রধ্যান সূত্তে (পরিচ্ছেদ ১৭, ১৫-১৯) বলা হয়েছে, " সমস্ত বেদেই পশু হত্যার কথা বলা হয়েছে এবং এই কাজ হচ্ছে পাপ কাজ।" এই সমস্ত সতকর্তামূলকূ নির্দেশ, ধর্মীয় অথবা অন্যান্য সব কিছুই সেই সময়ের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভর করা হয়েছিল। তবুও গো-হত্যা এবং গো-মাংস খাওয়া কখনও বন্ধ হয়নি।